OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 336 - 344
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার রূপায়ণে মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত উপন্যাস

তুহিনা কর
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID: tuhinakar146@gmail.com
0009 0000 2789 1606

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Mahasweta Devi, Novel, Postcolonial Consciousness, Colonialism, colonial power, Santal community, lower class.

Abstract
Mahasweta Devi's novel inspires us in many ways. Let us remind her in her birth cenetary. We know that the rule and exploitation remained the same even after India's independence, and this is also reflected extensively in Mahasweta Devi's novels. The colonial power has always tried to maintain its dominance; on the other hand, postcolonial consciousness provides the inspiration to stand up against this colonialism. Mahasweta Devi mainly used her real-life experiences in writing novels. Actually she believes in the 'documentation of society'. In her novel 'Jhansir Rani', the voice of women's protest begins, which is completely anti-British protest. Again, the novel 'Aranyer Adhikar' displays the Santal community's fight for their own rights. From the end of this novel, we can see the beginning of another novel 'Chotti Munda Ebong Tar Teer'. This novel has images of fantasy. In her another novel 'Kavi Bandyaghati Gnayir Jiban O Mrityu', Mahasweta presents the tragic consequences of the aspirations or dreams of a lower-class person. Mahasweta Devi wants to break the feudal social system, liberation from social exploitation and rule through the destruction of imperialist power. Judging from this perspective, the values of postcolonial consciousness are easily captured in her novels. Let us find the postcolonial consciousness among tribal people or lower-class people.

Discussion

> "লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেননা, একমাত্র সেভাবেই আমার মতে, উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর, আরো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোন আকাশে। আমি বিশ্বাস করি, গণ ও সমাজজীবন আশ্রিত ইতিহাসচর্যায়। ইতিহাসচর্যা, আমার মতে, সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক, মূল শিক্ষা।"[১]

মহাশ্বেতা দেবীর এই কথাগুলো আমাদের কাছেও যথার্থ হয়ে উঠে তাঁর সাহিত্যকৃতির মধ্য দিয়ে। তাঁর উপন্যাসবিশ্ব আমাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তিনি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মূলত সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন। আমরা জানি, শাসন-শোষণ ভারত স্বাধীনের আগে যেমন ছিল তার পরেও ঠিক একইভাবে থেকে যায়; তার রূপ পরিবর্তন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছে শুধু। উপনিবেশ স্থাপনের ফলশ্রুতিতে মানুষ যে শোষণ নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েছিল, তার বাস্তব ঘটনা খুঁজতে চেয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তাই তিনি সেই শোষিত, পীড়িত মানুষদের বাস্তব ছবি তাঁর উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন। ঔপনিবেশিকতায় দুর্বলের উপর শোষণ-শাসন চালানো হয়; উপনিবেশ স্থাপনের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবে দুর্বলের উপর ঔপনিবেশিক শক্তি আধিপত্য বিস্তার করে। আর এই ঔপনিবেশিকতা থেকে উত্তরণের মাধ্যমে উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনা বিস্তার লাভ করে; মুণ্ডা জাতির বিদ্রোহ, রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর বিদ্রোহ, তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে হওয়া আন্দোলন সেই উত্তরণের বার্তা বহন করে। ঔপনিবেশিকতার রাজনীতির বিরোধী হচ্ছে উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ। উপনিবেশোত্তর চেতনা আসলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার শোষণ থেকে মুক্তির প্রেরণা জোগায়, পীড়িত মানুষদের মধ্যে আত্মসচেতনতাবোধ জাগায়, নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিরোধিতা করতে শেখায়, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে পদক্ষেপ নিতে প্রেরণা দেয়। সমাজজীবনে এটার একটা বিশেষ প্রভাব যেমন পড়েছে, তেমনি সাহিত্যেও এর বিস্তর প্রভাব লক্ষণীয়। ইতিহাসে আমরা ক্ষমতার ইতিহাসই আসলে দেখতে পাই, যেখানে সমস্ত ঘটনা উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিকোণে বর্ণিত হয়,সেখানে নিম্নবর্গের কোনো স্থান নেই। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী আসলে 'নিম্নবর্গের স্বর'কে তুলে আনার চেষ্টাই করেছেন। নিম্নবর্গের উপর উচ্চবর্গের নিপীড়ন তাঁকে ভেতর থেকে পীড়িত করে, তাই তিনি সেই পীড়নের ইতিহাস উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। তাঁর রচনায় নিজস্ব উপলব্ধিকে উপনিবেশোত্তর সময়ের বহুস্বরিক ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন।

ভারত স্বাধীনের পর থেকে আমরা আরেক পরাধীনতা দেখতে পাই। স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক মুক্তি নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকেও স্বাধীন হওয়া চাই। আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা আসলেই পাইনি। ঔপনিবেশিক অবসানের পর কোনো কিছুই রাতারাতি পরিবর্তন হয়নি, হওয়া সম্ভবও না। ইংরেজের কবল থেকে ভারত তো মুক্তি পেয়েছে,কিন্তু সাধারণ মানুষ স্বার্থান্বেষী উপনিবেশকের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। ঔপনিবেশিক অভিঘাতে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে দেশ ও সমাজে। আমরা দেখতে পাই, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, গণআন্দোলন প্রভৃতিতে সমাজ- জীবন এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন —

> "সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষে মানুষের জীবনের প্রত্যাশিত আয়ু ছিল গড়ে ৩৩ বছর। স্বাধীনতার কিছুদিন আগেই, ১৯৪৩- এ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পড়তে হয় দেশকে এবং অবিভক্ত বাংলায় ওই 'পঞ্চাশের মন্বন্তরে' প্রায় তিরিশ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এটা সত্যি যে ঐ দুর্ভিক্ষের সময় সামগ্রিকভাবে দেশে খাদ্যের বিশেষ অভাব ছিল না এবং মাথাপিছু খাদ্যের যোগান হ্রাস পাওয়া ঐ সংকটের কারণ ছিল না। কিন্তু বাংলার এই কুখ্যাত দুর্ভিক্ষ প্রমাণ করে গেছে, অর্থনৈতিক উত্থানপতনের খেলায় ভারতবর্ষের একশ্রেণীর মানুষ কি ভয়ানকভাবে অসহায়।"[২]

সেই সংকটময় সময়ের ইতিহাস মহাশ্বেতা রচনা করেছেন। তিনি ইতিহাসের ভেতর থেকে আরেক ইতিহাস খুঁজে বের করেছেন।

'মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য' নারীবাদী লেখিকা হিসেবেও বিশেষ খ্যাত। নারীবাদী চেতনা উপনিবেশোত্তর চেতনারই একটি অংশ বলা যায়। ঔপনিবেশিক শক্তি যেমন চিরকাল শোষিতদের উপর নিজস্ব আধিপত্য বজায় রাখতে চায়, তেমনি পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাও নারীকে নির্দিষ্ট গণ্ডিরেখার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। নারীকে প্রতিটা ক্ষেত্রে বাধা দিয়ে নিয়ম সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন নীতি-নিয়মের সৃষ্টি করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, যাতে করে নারীর উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারে। কিন্তু নারী সেই সীমানা থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে গেছে। নারীচেতনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে নারীর মধ্যে সচেতনতার জাগরণ ঘটায়। আজও বহুক্ষেত্রে আমরা নারীর এই আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, মহাশ্বেতা তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ঝাঁসীর রাণী'তে এই 'ভট্টাচার্য্য' উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। বিজন ভট্টাচার্যের স্ত্রী হিসেবে স্বামীপ্রদত্ত উপাধি তিনি ব্যবহার করেছিলেন বলা যায়,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমাজে সচরাচর যা চলে আসছে স্বামী কিংবা পিতার পরিচয়ে নারীর পরিচয়; তবে পরবর্তীতে নারীচেতনাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে 'মহাশ্বেতা দেবী' হিসেবে স্বনামে ভূষিত করে, অথবা আমরা বলতে পারি নারীচেতনাবাদী মনোভাবনা থেকেই তিনি নিজের নামে 'দেবী' উপাধিটি ব্যবহার করেছেন। পিতা বা স্বামীপ্রদত্ত উপাধি বর্জনের মাধ্যমে তিনি নিজস্বতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি শুধু কারো কন্যা বা কারো পত্নী পরিচয়ে সীমিত থাকতে চাননি। তিনি চেয়েছেন নিজস্ব পরিচয় এবং তিনি তা অর্জনও করেছেন, এটা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। ইংরেজের নীতির বিরুদ্ধে একা ছেলেকে নিয়ে লড়াই করেছিলেন লক্ষ্মীবাঈ। মহাশ্বেতা ইতিহাস খুঁড়ে বের করেছেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা নারীর বাস্তব জীবনগাঁথা। মণিকর্ণিকার পুরো জীবনকাহিনি বর্ণিত না হলেও নারীর প্রতিবাদী সত্তা তিনি এখানে উত্থাপন করেছেন। উপনিবেশকের অন্যায়-অত্যাচারে ক্লিষ্ট উপনিবেশিতের প্রতিবাদস্বরূপ উচ্চারণ— "মেরী ঝাঁসী দুংগী নহী।।"[৩]

ইংরেজের হাত থেকে ঝাঁসিকে রক্ষা করতে লক্ষ্মীবাঈ প্রতিবাদ করে গেছেন, যা থেকে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

মনিকর্ণিকার ঝাঁসির রানিতে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যের যে লড়াই, সিপাহি বিদ্রোহে সাধারণ মানুষের প্রাণ দিয়ে প্রতিবাদ করার চিত্র, সবটা মিলিয়ে মহাশ্বেতার ইতিহাসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আমাদেরকে আলোড়িত করেছে। ব্রিটিশের অত্যাচারে ক্লিষ্ট মানুষজনের মধ্যেও প্রাণের ভয় তুচ্ছ হয়ে যেতে দেখা যায়। তারা প্রাণের ভয় ত্যাগ করে ইংরেজ আক্রমণের বিরোধিতা করে। তাই ওদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

"কভি মর্ না হ্যায়, ভাই আজ মরুঙ্গা।
বাঈকে লিয়ে জান আবাদ করুঙ্গা।।
শমসের সে কাটকে মার তেলেঙ্গা।
জহাঁ মে আপনা নাম রাখুঙ্গা।।"[৪]

তাদের মধ্যে জনশ্রুতি ছিল যে আফঘানদের খুদাবক্সের সহকারী খুদাদাদ একথাটি বলেছিলেন, বাকি আফঘানরা এর থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর নিজ রাজ্যের পক্ষে লড়াই ইতিহাসের এক উজ্জ্বল ঘটনা। এই উপন্যাসটিতে ধ্বনিত হয়েছে নারীচেতনাবাদী কণ্ঠস্বর, যা সম্পূর্ণ ব্রিটিশ বিরোধী।

উপনিবেশোত্তর চেতনাবাদের আলোচনায় একটি অন্যতম দিক হচ্ছে 'নিম্নবর্গীয় চেতনা' (Subaltern studies)। ১৯৮২ সাল থেকে এই চিন্তাচেতনার শুরু হয়। আর এটাকে এগিয়ে নিয়ে যান রণজিৎ গুহ, দীপেশ চক্রবর্তী, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ প্রমুখ। ইতিহাস তথা সমাজজীবনেও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই একটি অনিবার্য ঘটনা। সাঁওতাল গোষ্ঠীর নিজস্ব অধিকারের প্রতিবাদ সংবলিত উপন্যাস হচ্ছে 'অরণ্যের অধিকার'; সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই এখানে রয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের বহু বছর পরেও মহাশ্বেতা সেই ইতিহাসকে ফিরে দেখতে চান। তাই তো উপন্যাসের ভূমিকায় জানিয়েছেন—

> "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিরসা মুণ্ডার নাম ও বিদ্রোহ সকল অর্থেই স্মরণীয় ও তাৎপর্যময়। এ দেশের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর জন্ম ও অভ্যুত্থান, তা কেবলমাত্র এক বিদেশি সরকার ও তার শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, একই সঙ্গে এ বিদ্রোহ সমকালীন ফিউডাল ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এ সমুদয় ইতিহাসের বিবেচনা ভিন্ন বিরসা মুণ্ডা ও তাঁর অভ্যুত্থানের যথার্থ বিবেচনা অসম্ভব।"[৫]

মুণ্ডারা তাদের জীবিকার জন্য অরণ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে, তাই বিরসা সেই অরণ্যের অধিকারটাই চেয়েছিল। ব্রিটিশ শক্তি এবং দিকুরা তাদের কাছ থেকে অরণ্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল। ছোটনাগপুরের সাঁওতালদের কাছে 'ভাত' ছিল একটা স্বপ্ন। বিরসার মনে তাই প্রশ্ন জাগে—

> "মুন্ডা শুধা ঘাটো খাবে কেন? কেন সে দিকুদের মতো ভাত খাবে না?"[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কিন্তু তার এই লড়াই শুধু ভাতের জন্য নয়, সে লড়াই করেছে সাঁওতালদের নিজস্ব অধিকার ফিরে পেতে। উপনিবেশ স্থাপনের পরই শুরু হয় এই শোষণলীলা। আর এক্ষেত্রে ব্রিটিশদের সাহায্য করেছে কিছু ভারতীয়রাই, যাদেরকে এখানে আদিবাসীরা 'দিকু' বলেছে।

আদিবাসীদের প্রাণকেন্দ্র ছিল অরণ্য। এই অরণ্যের উপর নির্ভর করেই তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হত। কিন্তু তদের সেই অস্তিত্বকে গ্রাস করেছে অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক শক্তি অর্থাৎ দিকুদের অত্যাচার। বিরসা এক সময় জানায় যে, সে অরণ্যের ডাক পেয়েছে। অরণ্যকে মাতৃজ্ঞানে মায়ের ক্রন্দন শুনতে পায় সে, তাই সে দিকুদের কাছ থেকে অরণ্যকে মুক্ত করতে চায়। ছোট থেকেই বিরসার মধ্যে একটা গুণ ছিল, যেটা তাকে সবার থেকে আলাদা করেছে। তার মধ্যে নেতৃত্ব প্রবণতা ছিল প্রথম থেকেই। আমরা তার প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার স্পষ্ট স্বর শুনতে পাই—

> "দিব, দিব তোমারে শুদ্ধ করে, হা তুমি মোর মা বট, সকল মুন্ডার মা বট তুমি, তোমা হতে ঘরের চাল, ঘরের দেওয়াল, ক্ষুধায় কন্দ-ফল-মূল-খরাবরা-শজারু-হরিণ-পাখির মাংস মা গো!"[৭]

বিরসা ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণ থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখে, তাই সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার মধ্য দিয়েই সমস্ত আদিবাসীদের মধ্যে প্রতিবাদের জাগরণ দেখা দেয়। সবাইকে সে একজোট করে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। উপন্যাসে তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে— 'উলগুলানের শেষ নাই! ভগবানের মরণ নাই'। বিরসা সবার কাছে ভগবান রূপে ধরা দিয়েছে, যে কিনা সেসব শোষিতদের মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটাতে পেরেছিল। শোষিত আদিবাসীদের মধ্যে চেতনাশক্তির জাগরণ ঘটাতে পেরেছিল বলেই তাদের কাছে সে হয়ে ওঠে তাদের ভগবান। আর সেজন্যই ইংরেজরা আরও জোর দিয়ে তাকে পদদলিত করার চেষ্টা শুরু করে। উপনিবেশক শক্তি কোনো দিনই চায় না যে শোষিতদের মধ্যে আত্মসচেতনতাবোধ জাগ্রত হোক। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য বলেছেন—

> "উপনিবেশের সময় বহুবিধ শোষণ-ধ্বস্ত আদিবাসী সমাজে কীভাবে বিধৃত হয়েছিল এবং কীভাবেই বা গড়ে উঠেছিল আধিপত্যবাদ প্রত্যাখানের আর্তি ও প্রতিরোধের আকল্প— মহাশ্বেতা তাকে ধরেছেন উপনিবেশোত্তর চেতনার নিরিখে।"[৮]

শোষিতরা শিক্ষার দিক দিয়ে পিছিয়ে থাকে বলেই চিরকাল শোষিত-নিপীড়িত হয়। বিরসা শিক্ষাগ্রহণের ফলেই বুঝতে পারে শোষণের ইতিহাস। অমূল্য আর সে চাইবাসা স্কুলে একসাথে পড়াশোনা করলেও সে আর পড়াশোনার দিকে এগোতে পারেনি। অমূল্যের কাছ থেকে সভ্য সমাজের জ্ঞান লাভ করতে পেরেছিল সে। কিন্তু দিকু হয়েও অমূল্যের মনে নির্যাতিতদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ পায়। আমরা তার নোটবুক থেকে জানতে পারি জেল নামক রাষ্ট্রযন্ত্রের সত্য। মুন্ডাদের উকিল ছিল জেকব। আদালত, ব্রিটিশ প্রশাসন ও বিচারের মিথ্যা আচরণ তার মাধ্যমেই লক্ষ করা যায়। বিরসা ১৮৯৫ সালে ধরা পড়েছিল এবং কারাদণ্ডে আড়াই বছর ছিল। সেখানেও সে উলগুলানকে অনির্বাণ রেখেছিল। বিভিন্ন দিক দিয়ে আদিবাসীদের উপর শোষণকার্য শুরু করে দেয় উপনিবেশক; একদিকে ছিল দুর্ভিক্ষ-মহামারী, অন্যদিকে দিকুদের কর বৃদ্ধি এবং অত্যাচারে বিরসারা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। বিরসা ১৮৯৭ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার উলগুলানের ঘোষণা করে। সকল আদিবাসীদের একত্রিত করে সে বলেছে—

> "তোমাদের হাতে সময় নাই। এতকাল ভেবেছি মুন্ডার শত্রু কে? কে তার দুশমন! এই জমিদার-জোতদার-মহাজন? যারা এসে আমাদের ক্ষেতে খামারে জুড়ে বসেছে শুধু তারাই দুশমন? না, যারা খুটকাট্টি গ্রামগুলো জমিদারদের হাতে তুলে দিল, সেই সরকার।"[৯]

তারা বিরসার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গণ-আন্দোলনে। বহিরাগত সংস্কৃতি দমন করতে, পূর্বপুরুষের সব কিছু ফিরে পেতে তারা আন্দোলন করে।

আমরা দেখতে পাই তাদের বিদ্রোহের আগুন প্রথমে দিকুদের বিরুদ্ধে ছিল, পরবর্তীতে এই আন্দোলন মিশনারি, সরকার ও ইংরেজের বিরুদ্ধে পর্যবসিত হয়। তারা নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার্থে সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঔপন্যাসিক উপনিবেশোত্তর মূল্যবোধে বিরসার আন্দোলনের কথা বলেছেন। একসময় বিরসা ধরা পড়ে, বলা যায় তাকে ধরিয়ে দেওয়া হয়। শশিভূষণ রাই ও ছয়জন মুন্ডার জন্যই সে ধরা পড়ে, আর এইজন্য তারা পাঁচশো টাকাও পায়। তাদের কাছে এই পাঁচশো টাকাই ছিল অনেক, যার কারণে তারা লোভ সামলাতে পারেনি। তাই বিরসা এর জন্য নিজেকেই দায়ী ভেবেছে, কাউকেই দোষ দেয়নি। সেই মুহূর্তেও সে উলগুলানের স্বপ্ন দেখেছে। একমাত্র অরণ্যজননীর কাছে তার আত্মগ্লানির সান্ত্বনা পেয়েছে সে —

> "তুমি তো চেয়েছিলে বাপ! তুমি তো জানতে না সকল তোমার হাতে নেই। আমি, এই বনভূঁইটা, কি আমার আছি? যখন তোমার পিতাপুরুষ আচোটা জঙ্গলে গাছ কেটে আবাদ করে তখন আমি আমার ছিলাম। তা বাদে, মুন্ডার হাত হতে দিকুর হাতে, দিকুর হাত হতে সরকারের হাতে কিনা-বিচা, বিচা-কিনা হতে-হতে আমি, তোমার আদি জননী, অশুচি হয়া গিয়াছি বীরসা। তোমার কোনও দোষ নাই বাপ।"[১০]

বিরসা সকল আদিবাসীদের মনে যে চেতনার বীজ বপন করেছিল, তার ফল যে ভালো হবে না সে জানত। সে এটাও বুঝতে পেরেছে, তাকে জেলে পচেই মরতে হবে। তবুও সে সবাইকে সাহস জুগিয়ে চলে—

> "সাহস ছেড় না হে, ব'ল না ভগবান মোদের জেহেলে ঢুকায়ে চলে গেল। সকল হাতিয়ার তোমাদের দিয়াছি, বুকে সাহস দিয়াছি, চিনায়ে দিয়াছি কে তোমাদের দুশমন। সে হাতিয়ার তোমরা সঁপে দিও না, একদিন তোমরাই জিতবে।"[১১]

ব্রিটিশ আইন অমান্য করাতে মুন্ডাদের রাজদ্রোহী প্রতিপন্ন করা হয়। বিনা বিচারে মাসের পর মাস তারা জেলে থাকে। দীর্ঘকাল তারা জেলে নির্যাতিত হয়। তাদের উপর নিরন্তর মিথ্যা মামলা চালানো হয়। বেআইনিভাবে বিরসাকে জেলের মধ্যেই হত্যা করা হয় এবং দেখানো হয় তার মৃত্যু হয়েছে কলেরায়।

মহাশ্বেতা শোষিতদের হেরে যাওয়ার মধ্যেই দমিয়ে থাকেননি, এই প্রতিবাদী বিদ্রোহকে জীবন্ত রাখতে চেয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, ক্রিশ্চান অমূল্য আব্রাহাম মুন্ডা কেসের পর নিজের চাকরি ছেড়ে দেয় এই শাসননীতির অবমাননার জন্য। এভাবেই উপন্যাসটি 'সময়ের দলিলীকরণ' হয়ে উঠেছে।

এই উপন্যাসের শেষ থেকেই আমরা শুরু হতে দেখি 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' উপন্যাসটি। ১৯০০ সালেই বিরসার মৃত্যু এবং চোট্টি মুন্ডার জন্ম হয়। এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই কল্পনার ইমেজ আর ওই উপন্যাসে ছিল সত্যতা। উপন্যাসটিতে মিথকেন্দ্রিক বয়ানে মহাশ্বেতা সময়ের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন।

সময়ের পরিবর্তনেও যে শাসন-শোষণের রূপ বদলায়নি, এই উপন্যাসে মহাশ্বেতা এটাই দেখাতে চেয়েছেন। 'অরণ্যের অধিকার'-এর সঙ্গে তুলনা করেই বলা হয়েছে—

> "তোদের কালে ভগবান নাই, উলগুলান নাই, মুন্ডাদের জীবন পালটে যাবে বলে বুকে আগুন নাই, সে আগুনের তাপে মহাজন-পুলিশ-সিপাইয়ে তিরে বিঁধা নাই, চোট্টি মেলা আছে। মুন্ডাদের জাতরে ওই রকমে ভুলায়ে রেখেছে গোরমেন।"[১২]

চোট্টি মুন্ডা তির ছোঁড়া শিখেছিল ধানী মুন্ডার কাছেই। বলা হয় তার তির মন্ত্র-পড়া। ইতিহাস থেকেই চোট্টি মুন্ডার জীবনে এক একটা গল্প হয়ে এসেছে। গ্রামের প্রত্যেক তির প্রতিযোগিতায় সে-ই প্রথম। মহাশ্বেতা চোট্টির তিরকে এখানে প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের জীবনে এটা তির হয়েই থেকে যায়নি, উপার্জনের একটা মাধ্যমে হয়ে উঠেছে। চোট্টি বছরে পঁচিশ টাকা উপার্জন করে তির খেলেই। এই টাকা দিয়ে তারা গাই কেনে, বিয়েও করে আবার ভোজও হয় তাদের। উপনিবেশকের শোষণ-শাসন তাদের আর গায়ে লাগে না, এটাকে তারা তাদের জীবন হিসেবেই মেনে নিয়েছে। তাদেরকে চাষ করতেও দেওয়া হয় না। হরবংশের ইটভাটায় যেখানে নগদ মজুরিতে কাজ করতে পারা যায়, সেটা না করে তার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

পরিবর্তে বেঠবেগারী জুলুম চলে। মুন্ডাজাতির অস্তিত্বের সংকট ক্রমাগত বেড়েই চলে; চোট্টি ও ভরতের কথোপকথনে তাদের কষ্টের দিকটাও উঠে আসে—

> "শালোরা বেগারী দিতে ডাকে সকল সময়ে। তা দিলাম। কিন্তুক ক্ষেতের ফসল, আঙিনার সবজি, ঘরপালা মুরগি-ছাগল, এ ভি যদি বেচতে না পারি, তবে জাহানটো বাঁচে, কেমন করে তাই বল? পেটে তো খাব দুটা?"[১৩]

এরকম অবস্থায় তারা মিশনের সাহায্য নিতে মিশনেই চলে যায়। আবার দিকুরা এই মুন্ডা সমাজকে ভারতীয় ভাবতে চায় না। তারা ভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামটা শুধু তাদেরই সংগ্রাম, এই আদিবাসীদের নয়। আমরা দেখতে পাই, মুন্ডাদের মতো তপশিলি জাতিরও অস্তিত্বসংকট দেখা দেয়। সমস্ত আদিবাসী সমাজ রোমিও, পহলোয়ান, দিলদারদের অত্যাচারে আঁতকে ওঠে।

একসময় বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায়, এর কারণ হচ্ছে বিদ্রোহের সুর চলে যায় রাজনীতির দিকে। চোট্টি বেশি মজুরি পেয়েও সেটা প্রত্যাখ্যান করতে দেখা যায়। এভাবেই যেন প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে উলগুলানের সুর জ্বলতে থাকে। ভারত স্বাধীন হয়, আসে ভোট, দলীয় রাজনীতি, এম.এল.এ, তবে কোনোভাবেই কিন্তু ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। গ্রাম থেকে যায় প্রান্তিক হয়েই। বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেও মুন্ডা এবং তপশিলি জাতির কোনো পরিবর্তন হয় না। তারা কোনো আন্দোলন করলেও তাদেরকে জেলে রাখা হয়, অত্যাচার তো চলতেই থাকে। এজন্যই তারা নিজেদেরকে আত্মগোপন করে রাখে 'আদিবাসী জঙ্গলভারতী', 'বীরসা দল', 'আদিবাসী সেবক সমিতি' সকল সংস্থার দল।

১৯৭৭ সালে আবার দেখা যায় নির্বাচন হয়েছে, জনতা সরকার সেই মিটিং করে চোট্টিতে। অহিংসা নীতি দিয়ে তারা চোট্টির সমস্যাকে মুক্ত করতে চায়। নীতি করা হয়, এর উদ্দেশ্যও গঠন হয়, পরিবর্তন হয়; কিন্তু মুন্ডাদের জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে না। তাই পরবর্তীতে চোট্টির স্থানে তার ছেলে হরমু আসবে। পীড়নযন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের এই আন্দোলন চলবে। যখন রোমিও এবং পহলোয়ানের তিরবিদ্ধ মৃতদেহ পাওয়া যায়, তখন প্রশাসন তির প্রতিযোগিতার খেলায় হানা দেয়। কিন্তু বৃদ্ধ চোট্টি জোর গলায় বলেছে 'তাদেরকে মারছি আমি'। অন্যদিকে হাজার লোকের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়— 'না'। এর থেকেই তাদের একতা বোঝা যায়। আমরা দেখেছি—

> "একদিকে চোট্টি, অন্যদিকে এস.ডি.ও, মাঝে শূন্যে উত্তোলিত হাজার ধনুক। আর অনেক উত্তোলিত হাতে সাবধান ঘোষণা।"[১৪]

মহাশ্বেতা স্বাধীনতা পরবর্তী ক্ষয়িত সমাজ-ব্যবস্থাকে কাছে থেকে পরখ করেছেন। তাই তিনি ইতিহাস খনন করে লোকজ উপাদানকে এখানে পেশ করেছেন। তিনি আদিবাসীদের প্রতিবাদকে মিথের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি এই শোষণ-শাসনের মুক্তি চান, এদিক থেকে লক্ষ করলে সহজেই ধরা পড়ে উপনিবেশোত্তর চেতনার মূল্যবোধটি।

মহাশ্বেতা কোনো ইতিহাসবিদ নন, কিন্তু তিনি ইতিহাস থেকে রসদ সংগ্রহ করেছেন। তিনি সেই ইতিহাসের সন্ধান করেছেন যেটা সচরাচর আমাদের চোখে পড়ে না। ইতিহাসের ভেতর থেকে তিনি নিম্নবর্গের স্বর তুলে ধরেছেন। তাঁর এরকমই একটি উপন্যাস হচ্ছে 'কবি বন্দ্যঘটি গাঞিঁর জীবন ও মৃত্যু'। উপন্যাসটিতে নিম্নবর্গের অবস্থান আমরা দেখতে পাই। উপন্যাসটির ভূমিকায় আমরা দেখি—

> "ষোড়শ শতকের রাঢ়বাংলার ইতিহাস বিভিন্ন কারণে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। একদিকে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রায় একই সময়ে মানবিকতাবাদী ধর্মের এক সুবিপুল নবজাগরণের পটভূমিকাটি ছিল, যা আধুনিক পৃথিবীর উদার মানবিকতাবাদী চিন্তার অন্যতম মাতৃ-উৎস বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এতবড়ো কথা বাদ দিলে বলি, আমার মনে হয়েছিল, যে মেদিনীপুর, এতরকম বিচিত্র আদিবাসী সম্প্রদায়, লোকসংস্কৃতির জন্ম ও ধাত্রীভূমি, মেদিনীপুরের অবস্থিতি কলিঙ্গসীমান্তে হবার দরুন, চৈতন্যপ্রভাবে সেখানকার নিম্নবর্গের জাতির মধ্যে মানুষ হিসেবে নিজেকে জানবার ও জানাবার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> একটি প্রয়াস নিশ্চয় দেখা দিয়েছিল। এই চেতনার প্রমাণ কাব্য, পাঞ্চালী, গাথা, গীতি, পোটো-নাচের ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছিয়েছে।”[১৫]

ইতিহাসে আমরা ‘চুয়াড় বিদ্রোহ’ পাই, এই উপন্যাসেও চুয়াড়রা হচ্ছে একলব্যের স্বজাতি, তাদের প্রধান অস্ত্র ধনুক। হাতি ও নাগ তাদের প্রধান দেবতা হিসেবে গণ্য। বিপদের সময় তারা রাজাদের হয়ে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ শেষ হলে চলে যায় আবার অরণ্যে।

আমরা দেখেছি বাংলায় এক রেনেসাঁর যুগ সৃষ্টি হয়েছিল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে। কিন্তু অন্যদিকে উচ্চবর্গীয়রা নিজেদের ক্ষমতা অটুট রাখতে সমাজের মূল স্রোতের বাঁক ফিরিয়ে দিয়েছিল। সমাজসংস্কারের স্রোতকে বুঝতে পেরেছিল উচ্চবর্গীয় হরিশ রায়া।

তৎকালীন উচ্চবর্গীয় সমাজব্যবস্থা মহাপ্রভু প্রেরিত সমাজসংস্কারের মূলস্রোতকে নষ্ট করে দিয়েছিল। তারা নিম্নবর্গের উপর অবিরত অত্যাচার করে চলে যাতে নিম্নবর্গীয়রা সংস্কার-মুক্ত সমাজ গড়তে না পারে। ঔপন্যাসিক আসলে বর্তমান সময়ের মাপকাঠিতে এনে ধরতে চেয়েছেন মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চুয়াড়দের। ভীমাদল গ্রামের পাশে রয়েছে একটি গর্গবল্লভের প্রাসাদ। সেখানে রাজার ‘ধন জন মান’ সব আছে, নেই শুধু কবি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় রাজাদের কাছে কবির গুরুত্ব ছিল অনেক। রাজার খ্যাতিকে রাজকবি প্রচার মাধ্যমে চিরস্থায়ী করে রাখত। আবার রাজকবিরাই অত্যাচারী রাজার প্রশংসা জনমানসে পৌঁছে দিত। কিন্তু সেই সমাজে চুয়াড়রা ছিল সমাজের বাইরে অর্থাৎ যেখানে নগরের অপরিষ্কার জল প্রবাহিত হয়ে রোগ, শোক, মহামারীতে আক্রান্ত হত মানুষগুলো; যেটা হচ্ছে অন্ত্যজ পল্লিনগরের ঢালুস্থান। টিলার উপরে রাজাদের প্রাসাদ, যাতে তারা নিম্নবর্গের ছোঁয়া বাঁচিয়ে থাকতে পারে। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, প্রান্তিক মানুষগুলো উচ্চবর্গীয়ের কাছে নিকৃষ্ট অথচ প্রয়োজনে সেই প্রান্তিক মানুষকেই তারা ব্যবহার করে। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির সংস্পর্শে প্রান্তিকদের থাকার কোনো অধিকার নেই। ‘রামায়ণে’ যেমন শম্বুক নামে নিম্নবর্গীয় ব্যক্তির বেদপাঠের পরিণতি আমরা দেখতে পাই, তেমনি চুয়াড়দের মধ্যেও একলব্যের ধনুকবিদ্যার পরিণতি হিসেবে আঙুল কেটে নেওয়ার ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে নিম্নবর্গীয়রা উচ্চবর্গীয় মানুষদের দাসমাত্র। চুয়াড় কবি কলহন গর্গরাজার রাজকবি হয়েছে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে। শুধুমাত্র কবির রূপান্তর নয়, তৎকালীন সমাজের সে একজন উচ্চবর্গীয়দের প্রথম সারির হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা দেখি চুয়াড়রা তাকে কবি নয়, রাজা হিসেবেই চায়; রাজার কাছে তাকে রাজা করে দেওয়ার প্রার্থনা জানায় সকলে— ‘রাজো হে মোরা রাজা মাঙতে এসেছি’। এই গোপনীয়তার উদ্ভাসনে কবির সংকট বড় হয়ে দেখা দেয়।কবিকে চুয়াড় দলপতি বলতে দেখা যায় —

> “হা, দেখ্, তু চুয়াড় হঞে জন্মেছিস, চুয়াড় হঞে জন্ম কাটাবি, ই কথাটি তুর কপালে লিখা আছে। আলা মালা করলে তুর বুড়া আঙুল ছেদে দিব জানলি? চুয়াড়ের অত লড়তে চড়তে লাই, জানলি?”[১৬]

এক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে নিম্নবর্গরা। তাই তারা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে আরো বেশি পিছিয়ে যেতে থাকে। শাস্ত্র অনুযায়ী চুয়াড়দের অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকে চুয়াড়রাই, যা তাদের জন্মজন্মান্তরের সংস্কার। নিজেই চুয়াড় কবি এটা জানে যে —

> “যে ত্যেজে যবে তার মিত্যু হাতির পায়ের লিচে। ই শাসনটো পালকাপ্যমুনির। ইয়ার ছাড় ছোড় লাই।”[১৭]

কবির মিথ্যা অভিলাষে সমাজকেন্দ্রিক ইতরতার সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। একটা সময় আমরা রাজাকে চুয়াড় কবির উদ্দেশ্যে বলতে শুনি —

> “চুয়াড় হয়ে তুই ব্রাহ্মণের নাম নিলি, দেবী-বন্দনা রচলি দেবীর স্বপ্ন, এ নগরে আসবার উপদেশ, তোর প্রতিটি কথা মিথ্যা! আরে, তোকে আজ রক্ষা করে কে?”[১৮]

একসময় নিজের জাত-পাত সবকিছু ছেড়ে কলহন কবিত্ব খ্যাতি অর্জন করতে এসেছিল, কিন্তু তার স্বজাতিরাই তার স্বপ্নে বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে কবির পোষাক, আর পরতে হবে চুয়াড় পোশাক। সে কোনোভাবেই

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

চুয়াড়দের বোঝাতে পারে না যে, তার কাছে কবিত্ব হচ্ছে সত্য প্রকাশ। সে ধন-দৌলত করার আশা রাখে না, সে চায় শুধু কবিত্ব। তাই তো তার মুখে শোনা যায় —

> "ধনজন মাঙ্গি নাই হে! অন্য জন্মে যাব, অন্যরকম হব, সেই আকাঙ্ক্ষায় আমি ভীমাদলে আসি। রাজো হে! তুমি আমার কথাটা বুঝ! আমি শিকার খেলি, বাণের মুখে বাঘ বিন্দি, আর থাকি জঙ্গলের ভিতর যেঞে বসি। হাতির পাল খেলে, কুন্দে, জল ছেটে, তাই শুনে শুনে আমার মনে পাঞ্চালী উঠে আসে। পাঞ্চালী রচব হে, পাঞ্চালী বান্ধব, এই কথাটি সোঙ্ রে মোঙ্ রে আমার অঙ্গ বেথা করে। সে বেথার জ্বালা তোমরা জান না।"[১৯]

মাধবাচার্য কবির সাথে তার মেয়ের বিবাহ স্থির করেছিল। কিন্ত কবির প্রকৃত পরিচয় উদঘাটনের ফলে তা ভেঙে যায়। কবি চুয়াড় বংশে জন্ম নিয়ে ব্রাহ্মণ মেয়ের সাথে প্রেম করতে পারে না। কিন্তু কবির বিশ্বাস ছিল তার প্রেমে। সে তার প্রেমেই অনুপ্রেরণা খুঁজেছে। আর এজন্যই সে ফুল্লরার ইচ্ছা জানতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজা তাকে তিরস্কার করে —

> "মাধবের কন্যা যদি এখনো তুহ্মায় পতি চাহে তভে বোলুক কেনে, উয়াকে কানি পরায়্যে লাওয়ে ভাসয়্যে দিব। আর তুহ্মার পাপের পারাপার লাই হে!"[২০]

সমাজ কিভাবে দুর্বলের উপর জোর খাটায়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এখানে। ফুল্লরার ইচ্ছা থাকলেও তার কাছে বিকল্প রাস্তা নেই, এরকমভাবে শাসানো হয়। নিম্নবর্গের জন্য বিভিন্ন নিয়মাবলী অথবা শর্তাবলী বানিয়ে তাদেরকে আটকানোর চেষ্টা করে চলে তথাকথিত উচ্চবর্গীয়রা। জাত-পাতের এই ব্যবধানে সমাজ যে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে তাতে চুয়াড় কবির অস্তিত্বের সংকটটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। ফুল্লরার উক্তি 'জেত ভাড়িয়ে এসেছিলি, চুয়াড়', এটা থেকে বোঝা যায় নিম্নবর্গের অবস্থান আসলেই প্রান্তিক পর্বে। মহাশ্বেতা সেই নির্মম ছবিই উপন্যাসে এঁকেছেন—

> "ফুল্লরার শরীরের রক্ত বিমুখ হল, নাড়ীর রক্ত মুখ ফিরিয়ে উলটো দিকে বইল। শরীরের মাংসে সে দুটি মূলকৃমি থাকে তারাও মোচড় দিল। ঘৃণায় চামড়া রী-রী করল 'সাবধান ছুঁয়ো না!'"[২১]

চুয়াড় কবি কলহনের স্বপ্ন সাকার হতে পারেনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণেই। তাকে রাজা, পুরোহিতবর্গ থেকে শুরু করে ভীমাদলের চুয়াড়রা সকলেই বাধা দিয়েছে। চুয়াড়রা তাকে চেয়েছিল তাদের রাজা হিসেবে, কিন্তু সে রাজকবি হয়ে 'অভয়ামঙ্গল' রচনা করতে চেয়েছিল। আসলে তার দ্বিতীয় জন্ম স্বপ্নভঙ্গের কথকতায় পূর্ণ। ঔপন্যাসিক তাই বলেছেন —

> "ইতিহাস এ গল্পের পটভূমিকা, কিন্তু আসলে কবির জন্ম ও মৃত্যুর রক্তাক্ত ইতিহাস একেবারেই লেখকের মানসাশ্রিত। হয়তো আমি এমন এক যুবকের কথা লিখতে চেয়েছি যে তার জন্ম ও জীবনকে অতিক্রম করে নিজের জন্য একটি দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, যে জগৎ তার নিজের সৃষ্ট। চেয়েছিল নতুন জন্ম নিতে এবং সমসাময়িক সমাজ তার প্রত্যেকটি চেষ্টাকেই পরাভূত করেছিল, আমি হয়তো তার গল্পই লিখতে চেয়েছি।"[২২]

মধ্যযুগের ইতিহাসে কালকেতু যে দেবীর দেওয়া ঐশ্বর্য্য দিয়েই রাজার আসন লাভ করেছিল, কবি কলহন সেই দৈবিক আশীর্বাদ বিহীন হয়ে সমাজের বিরুদ্ধে নিজেই লড়াই করেছে। সে এতে হেরে গেছে ঠিক, কিন্তু চেষ্টা ছাড়েনি।

একজন নিম্নবর্গীয় মানুষের উচ্চাশা বা স্বপ্নের করুণ পরিণতিকে মহাশ্বেতা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নিম্নবর্গীয় মানুষের যোগ্যতা থাকলেও জাত-পাত, বর্ণ-বর্গ-লিঙ্গগত বিভাজনে তা বিষাদপূর্ণ হয়ে উঠে। এখানে কবির স্বপ্ন প্রতীকীময় হয়ে একদিকে ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শে নিম্নবর্গের স্থান অন্যদিকে নিম্নবর্গের মানুষের প্রতিভায় হয়ে ওঠার স্বপ্নে ব্যর্থতা দেখা দিয়েছে। প্রতিটা ক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয়দের চেপে রাখার চেষ্টা করে থাকে উচ্চবর্গীয়রা। তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 44
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 336 - 344
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> " 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু' প্রকৃতপক্ষে লেখক মহাশ্বেতার দ্বিতীয় জন্মের স্মারক। এই পাঠকৃতি তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।"[২৩]

ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে যে অত্যাচার শুরু হয়, সেটা কোন পর্যায়ে একটা সমাজকে তোলপাড় করেছিল; তা আজকের দিনে এসে আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। মহাশ্বেতা সেই সংকটের ইতিহাস উপন্যাসে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, এর জন্য তাঁকে বহু জায়গায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। তিনি সেই পীড়িত মানুষদের যন্ত্রণা অনুভব করতে পেরেছিলেন, যার জন্য তিনি চেয়েছিলেন উত্তরণ। আর এই উত্তরণ তখনই সম্ভব, যখন মানুষদের মধ্যে চেতনার জাগরণ ঘটে। তাই ঝাঁসির রানি, বিরসা, চোট্টি, এদের মতো মানুষের দরকার পড়ে; যারা সাধারণ মানুষের মনে নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা জাগাতে পারে, যাদের নেতৃত্বে শোষকদের বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন সম্ভবপর হয়। মহাশ্বেতা সেই শোষণ, অন্যায়-অত্যাচার থেকে মুক্তি চেয়েছেন বলেই সেখান থকে উত্তরণের বার্তা দিয়ে গেছেন।

Reference:

১. দেবী, মহাশ্বেতা, 'উপন্যাস ভাবনা', *বাংলা উপন্যাস : বীক্ষা ও অন্বীক্ষা,* সম্পা. সুবল সামন্ত, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৯
২. সেন, অমর্ত্য, *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪১৫, পৃ. ১৪৩
৩. ভট্টাচার্য্য, মহাশ্বেতা, *ঝাঁসীর রাণী।* নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৩, পৃ. ৭৭
৪. তদেব, পৃ. ২১২
৫. দেবী, মহাশ্বেতা, 'অরণ্যের অধিকার', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র,* অষ্টম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৬, পৃ. ৭৫
৬. তদেব, পৃ. ৭৭
৭. তদেব, পৃ. ১২২-১২৩
৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'অরণ্যের অধিকার : রাজনৈতিক সময়ের আকল্প', *উপন্যাসের সময়,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃ. ১৫৩
৯. দেবী, মহাশ্বেতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১০. তদেব, পৃ. ২১৫
১১. তদেব, পৃ. ২১৭
১২. দেবী, মহাশ্বেতা, 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র,* নবম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৩, পৃ. ২৮
১৩. তদেব, পৃ. ৮৮
১৪. তদেব, পৃ. ২৪৪
১৫. দেবী, মহাশ্বেতা, 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', *মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০০২, পৃ. ২১
১৬. তদেব, পৃ. ২৮
১৭. তদেব, পৃ. ২৯
১৮. তদেব, পৃ. ৩২
১৯. তদেব, পৃ. ৩৩
২০. তদেব, পৃ. ৩৪
২১. তদেব, পৃ. ৩৫
২২. তদেব, পৃ. ৩৬
২৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *উপন্যাসের ভিন্ন পাঠ,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১ বৈশাখ ১৪১২, পৃ. ৯৯